স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯-এর বাস্তবায়ন পর্যালোচনা

গবেষণা কাল : মে - অক্টোবর ২০১০

ডেক্রেসিওয়াচ
৭ সার্কিট হাউস রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৩৪ ৪২২৫-৬, ৮৩১ ১৬৫৭
e-mail:dwatch@bangla.net
web:www.dwatch-bd.org

সম্পাদনা

তালেয়া রেহমান
নির্বাহী পরিচালক
ডেমক্রেসিওয়াচ

গবেষণা পরিচালনা ও রিপোর্ট প্রণয়ন

সাইফুল ইসলাম
সমন্বয়কারী
মনিটরিং ও এভ্যালুয়েশন (এম এন্ড ই)

সমন্বয় ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে

ওয়াজেদ ফিরোজ
প্রোগ্রাম ডিরেক্টর
ডেমক্রেসিওয়াচ

সহায়তায়

কামাল হোসেন শাহ্, প্রোগ্রাম অফিসার, ডেমক্রেসিওয়াচ
মহিউদ্দিন মঈন, প্রোগ্রাম অফিসার, ডেমক্রেসিওয়াচ

সূচিপত্র

ভূমিকা..... ১

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির চিত্র..... ৪

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা : বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশসমূহ, স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন..... ৫

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষমতা ও আয়ের উৎস সম্পর্কিত সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি..... ৮

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ কমিটি নভেম্বর ২০০৭-এর উল্লেখযোগ্য সুপারিশ..... ১০

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম : আইনগত ও বাস্তবভিত্তিক বাধাসমূহ..... ১২

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা..... ১৬

গবেষণার উদ্দেশ্য..... ১৭

গবেষণা পদ্ধতি..... ১৭

গবেষণা এলাকা ১৭

নমুনায়ন ও নমুনার আকার..... ১৮

তথ্যসংগ্রহ ও বিশেষণ পদ্ধতি..... ১৮

গবেষণার যৌক্তিকতা..... ১৮

গবেষণার সীমাবদ্ধতা..... ১৮

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে স্থানীয় সরকার বিবর্তনের ইতিহাস..... ১৯

ফলাফল..... ২২

ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ ও ইউনিয়ন পরিষদ আইন ১৯৮৩-এর তুলনামূলক আলোচনা..... ২৬

এ আইনের ভালো দিকগুলো..... ২৭

এ আইনের খারাপ দিকগুলো..... ২৯

বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম..... ৩১

গভর্নেন্স অ্যাডভোকেসি ফোরাম..... ৩৫

সুপারিশমালা..... ৪৩

উপসংহার..... ৪৪

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের ইতিহাস বেশ প্রাচীন এবং ঘটনাবহুল। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে স্থানীয় সরকারের কাঠামো এবং এর কার্যক্রম। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সংবিধানে (৯, ১১, ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে) রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম অঙ্গ হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিধান রাখা হয়।

সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু রূপে বিবেচনা করা হয়েছে। সংবিধানের এ চারটি অনুচ্ছেদ দেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সকল আইন-কানুন প্রণয়নের উৎস। তবে এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয় (১) সংবিধানের এ চারটি অনুচ্ছেদে 'স্থানীয় সরকার' নামক কোনো শব্দ বা শব্দাবলী নেই। আছে 'স্থানীয় শাসন' এবং 'স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান'। (২) সংবিধান প্রণীত হওয়ার আগে থেকে এ দেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এ সম্পর্কিত আইন ও বিধান ছিল যার কিছু কিছু এখনও কার্যকর রয়েছে।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তথা ইউনিয়ন পরিষদগুলোর যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও দূর্বল আইনি কাঠামোর কারণে তৃণমূল পর্যায়ে আপামর জনসাধারণকে প্রত্যাশিত সেবা প্রদানে পুরোপুরি সফল হতে পারছে না। অনেকেই রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ও আমলাদের প্রভাবকে এর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে মত প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে বিগত (নির্বাচিত বা অনির্বাচিত) প্রায় সকল সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়নি।

স্থানীয় সরকারের পটভূমি

১৮৭০ সালের পাসকৃত চৌকিদারি পঞ্চায়েত আইন ও ১৮৮৫ সালে পাশকৃত বেংগল সেলফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন হয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সময়ে বহু আইন ও অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এসব আইনগত দলিলের মধ্যে ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ও ১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ড ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশ দ্বারাই মূলত পরিচালিত। ১৯৯৭ সালে শুধু ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়ানো এবং মহিলাদের

সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করে একটি আইন পাস হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য বিধি-বিধান প্রায় অপরিবর্তিতই রয়েছে।

১৯৮৩-এর অধ্যাদেশের ৩০-৮০ নং এবং ৮৩-৮৫ নং অনুচ্ছেদসমূহে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর বিশদ বিধান রয়েছে। তাছাড়াও ১৯৭৬ সালের গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ বলে ইউনিয়ন পরিষদের সীমিতভাবে আদালতের এখতিয়ারও রয়েছে। অতি সম্প্রতি বর্তমান সরকার ইউনিয়ন পরিষদের গঠন কাঠামোতে যে পরিবর্তনসমূহ করেছে সে পরিবর্তিত ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামোটি নিচে দেখানো হলো।

স্থানীয় সরকার বিষয়ক আইনের ধারাক্রম ও গতিপ্রকৃতি প্রধানত ৫টি প্রধান পর্যায় বা ভাগে বুঝতে হবে। সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে :

১. সংবিধান ও সংবিধানের স্থানীয় শাসন বা সরকার বিষয়ক অংশ
২. বিভিন্ন সময়ে পাস হওয়া আইন ও অধ্যাদেশ
৩. আইন বা অধ্যাদেশের আওতায় তৈরি করা বিধি
৪. সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যেমন জেলা পরিষদ, সিটি করপোরেশন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক আইন ও বিধির আওতায় তৈরি করা উপ-আইন বা উপবিধিসমূহ এবং
৫. সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা অধিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত সার্কুলারসমূহ

বিএনপি প্রথম (১৯৯১-৯৬) শাসন আমলে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার যথাযথ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকভাবে প্রণীত বিকেন্দ্রীকৃত কাঠামোর পরিবর্তন না করেই উপজেলা ব্যবস্থা ও কাঠামো ভেঙে দেয়। ১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে নতুন ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু অন্যান্য উচ্চতর ক্ষেত্রে স্থানীয় সংস্থা গঠনের লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত ১৯৯২ সালে সংসদে একটি বিল উত্থাপন করা হয়। ২৪ নভেম্বর ১৯৯১ সালে স্থানীয় সরকারসমূহের কাঠামোর কার্যকারিতা পর্যালোচনা, বিশেষ করে বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর আলোকে স্থানীয় সরকারসমূহের কাঠামো পুনর্বিন্যাস সম্পর্কিত সুপারিশ পেশ করার জন্য কমিশন গঠন করেছিল। কমিশন ৩০ জুলাই ১৯৯২ সালে পল্লী এলাকায় দুই স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সুপারিশ করে। প্রথম স্তর হলো, গ্রামভিত্তিক ইউনিয়ন পরিষদ এবং দ্বিতীয় স্তরে জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ। এই কমিশন গ্রাম সভার গঠনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে জবাবদিহি ও কার্যকর করার সুপারিশ প্রদান করে।

আওয়ামী লীগ শাসন আমলে (১৯৯৬-২০০১) শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার স্থানীয় গণতান্ত্রিক নীতির ওপর ভিত্তিশীল টেকসই একটি স্থানীয় সংস্থার সুপারিশ প্রণয়নের জন্য স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করে। সে অনুযায়ী কমিশন চার স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার গঠনের সুপারিশ করে। যেমন– গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ। আওয়ামী লীগ শাসন আমলে ইউনিয়ন পর্যায়ে সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচন ব্যতীত কমিশনের আর তেমন কোনো সুপারিশ বাস্তবায়ন করেনি।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির চিত্র

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের আলোকে বিভিন্ন সময়ে সামরিক/ বেসামরিক সরকার স্থানীয় সরকার কাঠামো, স্তর, ক্ষমতায়ন নিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাসীন প্রায় সব সরকার তাদের শাসন আমলে তৃণমূলের জনগণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিশন গঠন করেছে। এসব কমিশনের গঠনের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করলে স্থানীয় সরকারের বর্তমান ধারা বিশ্লেষণ সহজ হবে।

কমিশনের নাম	চেয়ারম্যান/ সভাপতি	রাজনীতিবিদ	আমলা	গবেষক /শিক্ষক	স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি
স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন ১৯৯২	নাজমুল হুদা (মন্ত্রী)	৬ জন	৮ জন	৩ জন	নেই
স্থানীয় সরকার কমিশন ১৯৯৭	রহমত আলী (এমপি)	৩ জন	৩ জন	২ জন	নেই
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষমতা ও আয়ের উৎস সম্পর্কিত সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৮	ড. এটিএম জহুরুল হক (অধ্যাপক)	নেই	৫ জন	৬ জন	নেই
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ কমিটি ২০০৭	ড. এ এম এ শওকত আলী (সচিব/আমলা)	নেই	২ জন	৩ জন	২ জন

উপরের সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গঠিত কমিটি/কমিশন আমলা-নির্ভর। রাজনৈতিক সরকারের সময়কালে গঠিত কমিশনের প্রধান ছিলেন রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং অরাজনৈতিক সময়ে গঠিত কমিশনের প্রধান ছিলেন আমলা। সকল কমিটি/কমিশনে সর্বাধিক সদস্যও ছিলেন আমলারা। তাছাড়াও স্থানীয় সরকার বিষয়ে গবেষণা করেছেন এমন শিক্ষক বা গবেষকদের রাখা হয়েছে। কেবল একটি কমিশনে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ আছে।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা : বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশসমূহ

স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন

(জুলাই ১৯৯২)

স্বাধীনতা

- স্বাতন্ত্র্য।
- স্থানীয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ কর্তৃত্ব।
- কর্মক্ষেত্রের স্বাধীনতা- নির্দিষ্ট এলাকায় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয়।
- প্রশাসনিক ক্ষমতা ও আর্থিক সঙ্গতি অর্জনের ক্ষমতা।
- অধিকারের স্বীকৃতি।
- জাতীয় সম্পদের ওপর স্থানীয় জনগণের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা।
- উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ।

সম্মান ও মর্যাদা

- স্থানীয় সরকারের মর্যাদার বৃদ্ধিকল্পে কেন্দ্রের সঙ্গে অধীনস্থ ও নিয়ন্ত্রণমূলক সম্পর্কের স্থলে গড়ে তুলতে হবে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক।
- স্থানীয় পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার স্থাপন একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সাধারণ আইন অর্ডিন্যান্স দ্বারা স্থাপন না করে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এর স্থায়িত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

স্থানীয় সরকার কমিশন

(মে ১৯৯৭)

প্রস্তাবিত গ্রাম পরিষদ দ্বারা সমর্থিত ইউনিয়ন পরিষদ হবে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশাসন এবং উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু ও চালিকা শক্তি। এই উদ্দেশ্যে আইন দ্বারা ইউনিয়ন পর্যায়ে সকল সরকারি সংস্থাকে ইউনিয়ন পরিষদের আওতাভুক্ত করে শক্তিশালী করতে হবে। এর জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ভবনকে রূপান্তরিত করতে হবে একটি কমপ্লেক্সে, যেখানে একই স্থানে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান, সদস্য ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল সরকারি কর্মকর্তার অফিস অবস্থিত হবে।

সরকারি দফতরের কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়ের পাশাপাশি এনজিওগুলোর কাজের সমন্বয়ের দায়িত্বও ইউনিয়ন পরিষদের ওপর বর্তাবে। সমবায়, বেসরকারি খাতে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদানও হবে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব।

ইউনিয়ন পরিষদের গঠন

(১) চেয়ারম্যান : ইউনিয়ন পরিষদের একজন চেয়ারম্যান থাকবেন এবং তিনি ইউনিয়নের প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

(২) সদস্য : ইউনিয়ন পরিষদের ৯টি ওয়ার্ড থেকে ৯ জন সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন।

(৩) মহিলা সদস্য : ইউনিয়ন পরিষদের তিনটি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। মহিলা সদস্যরা প্রতি তিন ওয়ার্ডে একজন, এই ভিত্তিতে পুরুষ ও মহিলা সকল ভোটারের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন।

(৪) কর্মকর্তা সদস্য : ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত ইউনিয়ন কৃষি ব্লক সুপারভাইজর, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকর্মী, পরিবার পরিকল্পনা কর্মী/ ডাক্তার, অন্যান্য সরকারি-আধা সরকারি দফতরের কর্মকর্তা/কর্মচারী, আনসার/ভিডিপি ইত্যাদি থাকলে তারা সদস্য হবেন। তবে তাদের ভোটাধিকার থাকবে না।

(৫) অন্যান্য সদস্য : সমবায় সমিতির প্রতিনিধি, মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি, পশ্চাৎপদ শ্রেণী/ শ্রেণীর প্রতিনিধি (যেমন- জেলে, তাঁতি, ভূমিহীন, দুস্থ মহিলা ইত্যাদি)। পরিষদের সভায় তাদের ভোটাধিকার থাকবে না।

পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

ইউনিয়ন পরিষদের সার্বক্ষণিকভাবে একজন সচিব ও একজন সহকারী সচিব থাকবে। সহকারী সচিব ট্যাক্স কালেক্টর এবং হিসাবরক্ষকের দায়িত্ব পালন করবে। ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৯ জন মহল্লাদার ও একজন দফাদার থাকবে।

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন অথবা এসিআর লিখবেন। চেয়ারম্যানসহ সকল সদস্য/ সদস্যা এই প্রতিবেদন লেখায় অংশ নেবেন।

ইউনিয়ন পরিষদের অবস্থান ও অফিস

বিদ্যমান ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে পরিষদের অফিস হবে। তবে নতুন স্থানে নতুন ভবন হতে পারে। সম্প্রতি গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউনিয়নের কেন্দ্রস্থলে ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ভবন তৈরি করা হলে সেখানে ইউনিয়ন পরিষদের সভার জন্য মিলনায়তন, চেয়ারম্যানের অফিস ছাড়াও ইউনিয়ন পর্যায়ে সকল সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীর অফিসের স্থান থাকবে।

সভা

ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি মাসে ন্যূনতম একবার সভা করবে।

স্থায়ী কমিটি

ইউনিয়ন পরিষদের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি স্থায়ী কমিটি গঠিত হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্মরত আছেন সেসব দফতরের জ্যেষ্ঠতম কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিজ নিজ বিষয়ভিত্তিক কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন। বিদ্যমান কর্মসূচি ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা ছাড়াও এসব কমিটি উদ্ভুত সমস্যা বিশ্লেষণ করবে এবং নতুন প্রকল্প ও কর্মসূচি চিহ্নিত করবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষমতা ও আয়ের উৎস সম্পর্কিত সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি

(এপ্রিল ১৯৯৮)

১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ও ১৯৯৭ সালে এ অধ্যাদেশে সংযোজিত সংশোধন এবং স্থানীয় সরকার কমিশন (১৯৯৬) কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশমালা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী নিম্নরূপ :

পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

চেয়ারম্যান, ৯ জন সাধারণ সদস্য এবং ৩ জন সংরক্ষিত সদস্য ছাড়াও সার্বক্ষণিকভাবে একজন সচিব, নয়জন মহল্লাদার ও একজন দফাদার থাকার কথা বলেছে। ইউনিয়ন পরিষদের ওপর অর্পিত বিভিন্ন কর আদায়ের জন্য একজন ট্যাক্স কালেক্টর থাকবে অথবা একজন সহকারী সচিব এ দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি হিসাবরক্ষণের কাজও করবেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের কর্মমূল্যায়ন রিপোর্ট অথবা এসিআর লিখবেন।

১৯৮৩ সলের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশের ৩৫ ধারায় বলা আছে যে, সরকার ইচ্ছা করলে সরকারি কোনো সংস্থা বা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোনো সার্ভিস ইউনিয়ন পরিষদের ব্যবস্থাপনায় হস্তান্তরিত করতে পারবে। স্থানীয় সরকার কমিশন (১৯৯৬) এই ধারা ব্যবহার করে সরাসরি ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারি সংস্থাসমূহের জনবল এবং তাদের কার্যাবলী ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে কমিশনের রিপোর্ট (১৯৯৭) পেশের পরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে অন্য কয়েকজন সচিব সমন্বয়ে গঠিত প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ কমিটি শুধু স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কয়েকটি দফতর/ পরিদফতরের গ্রাম ও ইউনিনয়ন পর্যায়ে কার্যকর কর্মচারী ও পরিচালিত কার্যক্রম, যথা : (১) স্বাস্থ্য সহকারী (২) পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকা এবং (৩) পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদের কাছে ন্যস্ত করার সুপারিশ করেছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী :

- প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান করা, শিক্ষার বিস্তার লাভে জনগণকে উৎসাহিত করা এবং এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তদারকি করা।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত ইউনিয়ন হেলথ সেন্টারে স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম তদারকি ও মনিটর করা। পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং স্যানিটেশন কার্যক্রমের উন্নয়ন সাধন করা।

- আন্তঃওয়ার্ড রাস্তাঘাট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষুদ্র সেচ ও পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা।
- ইউনিয়ন পরিষদের আওতাধীন রাস্তা ও বাঁধে ব্যাপক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।
- আন্তঃওয়ার্ড বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করা।
- নারী নির্যাতন, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলাসহ আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করা।
- গ্রাম পরিষদ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহের রেজিস্টার হালনাগাদকরণ।
- মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনে কার্যক্রম গ্রহণ।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা এবং স্থানীয়ভাবে উদ্ধার কার্যক্রমসহ সরকারি রিলিফ কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নে সহায়তা প্রদান এবং প্রয়োজনে বাস্তবায়ন করা।
- বিভিন্ন ব্যবসায় ও বৃত্তির লাইসেন্স প্রদান।
- এনজিওগুলোর কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।
- এলাকাধীন সকল সংস্থার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা এবং থানা/ উপজেলা পরিষদকে সে সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান।

উন্নয়ন পরিকল্পনা

মাঠ পর্যায়ে পরিকল্পনা শুরু হবে ইউনিয়ন পর্যায় থেকে। তবে এর জন্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং জরিপ গ্রাম পরিষদ পর্যায়ে সম্পন্ন করা হবে। গ্রাম পর্যায়ের উপাত্ত ও তথ্যের ভিত্তিতে এবং অনুমোদিত মডেল পরিকল্পনা ছক অনুযায়ী পাঁচ বছর মেয়াদী ইউনিয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে। এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে :

(ক) ভৌত অবকাঠামো : যেমন– রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কার্লভার্ট, বাঁধ নির্মাণ, বীজাগার, কমিউনিটি সেন্টার, ক্লিনিক ইত্যাদি।

(খ) সেচ ব্যবস্থা : খাল খনন, পুনঃখনন, ছোট স্লুইস গেট নির্মাণ।

(গ) শিক্ষা : প্রাইমারি স্কুল ও মাদ্রাসা স্থাপন, ভবন নির্মাণ ও সংস্কার।

(ঘ) স্বাস্থ্য : ক্লিনিক ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন ও নির্মাণ।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ কমিটি নভেম্বর ২০০৭-এর উল্লেখযোগ্য সুপারিশ

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করতে গত ৩ জুন ২০০৭ স্থানীয় সরকার বিষয়ে অভিজ্ঞদের সমন্বয়ে ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে।

স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের মতামতের ভিত্তিতে পাঁচ মাস পর কমিটি একটি সমন্বিত সুপারিশমালা দেয়। গত ১৩ নভেম্বর ২০০৭ সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ করে। জনবল বৃদ্ধি, অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীর এসিআর প্রস্তুতের ক্ষমতা, স্থানীয়ভাবে আয়ের পরিধি বৃদ্ধি, সদস্যপদে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে শতকরা ৪০ ভাগ নারী প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা, নাগরিক সনদ, গ্রাম সরকার ব্যবস্থার বিলুপ্তি, স্থানীয় সরকারে সংসদ সদস্যদের উপদেষ্টা হিসেবে না থাকা, নির্বাচনে অযোগ্যতা বিষয়ক শর্তাবলী প্রভৃতি বিষয় এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া স্তরবিন্যাস ও জনবল কাঠামোর বিষয়টি সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও সুপারিশ করা হয়েছে। সার্বিকভাবে বিবেচনা করে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যক্রমে আইনগত ও বাস্তবভিত্তিক বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সুপারিশ :

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান স্তরবিন্যাস অক্ষুণ্ন রেখে প্রতি জেলায় জেলা পরিষদ, উপজেলায় উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত খসড়া অধ্যাদেশ চূড়ান্ত করে সংশ্লিষ্ট পরিষদ গঠন;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য স্থানীয় পরিষদ চাকরি কাঠামো (লোকাল কাউন্সিল সার্ভিস) গঠন;
- প্রতিটি স্তরে প্রয়োজনভিত্তিক (নিড বেজড) জনবল কাঠামো স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কার্যপরিধির আলোকে নির্ধারণ;
- জনবল কাঠামোর আওতায় আনুষঙ্গিক অফিস সরঞ্জামাদিসহ যানবাহনের সংখ্যা নিরূপণ এবং টেবিল অফ অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট (টিওঅ্যান্ডই) অনুযায়ী প্রতিটি ক্ষেত্রের অনুন্নয়ন ব্যয় বাজেটে প্রতিফলন ও অনুমোদন;
- চাকরি কাঠামোর বিষয়ে বিদ্যমান সরকারি নিয়ম পরিবর্তন করে স্থানীয় সরকারের জন্য নতুন নিয়ম প্রবর্তন করে কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকারের চাকরি ও জনবল কাঠামো সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্ত স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়ার ক্ষমতা প্রদান;
- স্থানীয় পরিষদের জন্য প্রণীতব্য চাকরি বিধিতে সচিব ও হিসাবরক্ষক নিয়োগের যোগ্যতা হিসেবে কমপিউটার পরিচালনার দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করা এবং এ জন্য তাদের একটি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট দেয়া;

- প্রতি ইউনিয়ন পরিষদে একটি হিসাবরক্ষকের পদ সৃষ্টি করে কমপিউটার জ্ঞানসম্পন্ন উপযুক্ত ব্যক্তিদের প্রচলিত বিধান অনুযায়ী নিয়োগ দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া;
- ইউনিয়ন পরিষদের কমপিউটারের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় মেটানোর জন্য বাজেট বরাদ্দের বিষয়ে সরকার কর্তৃক যথাযথ সিদ্ধান্ত নেয়া।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায় (যদি থাকে) প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার কমিশনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে আসন নির্ধারণ করা;

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম : আইনগত ও বাস্তবভিত্তিক বাধাসমূহ

বিভিন্ন কমিটি/কমিশনের সুপারিশসমূহের তুলনামূলক চিত্র

ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নে ইস্যুসমূহ	স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন ১৯৯২	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ : স্থানীয় সরকার কমিশন ১৯৯৭	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষমতা ও আয়ের উৎস সম্পর্কিত সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৮	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ কমিটি ২০০৭
পরিষদের জনবল ও কাঠামো	প্রতিটি ইউনিয়ন ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত হবে। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে একজন করে মোট ৯ জন ওয়ার্ড সদস্য নির্বাচিত হবেন। ইউনিয়নে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন এবং ইউনিয়নের সকল ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে, তিনটি সংরক্ষিত আসনে তিনজন মহিলা সদস্যা নির্বাচিত হবেন।	ইউনিয়ন পরিষদে একজন চেয়ারম্যান, পরিষদের ৯টি ওয়ার্ড থেকে ৯ জন সদস্য এবং তিনটি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ইউনিয়ন পরিষদের সার্বক্ষণিকবাবে একজন সচিব ও একজন সহকারী সচিব থাকবে। সহকারী সচিব ট্যাক্স কালেক্টর এবং হিসাবরক্ষকের দায়িত্ব পালন করবে এবং পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৯ জন মহল্লাদার ও একজন দফাদার থাকবে।	ইউনিয়ন পরিষদে একজন চেয়ারম্যান, ৯ জন সদস্য এবং মহিলাদের জন্য তিনটি সংরক্ষিত আসন ছাড়াও সমবায় সমিতির প্রতিনিধি, মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি, পশ্চাৎপদ শ্রেণী/ শ্রেণীর প্রতিনিধি (যেমন : জেলে, তাঁতি, ভূমিহীন শ্রমিক, দুস্থ মহিলা ইত্যাদি)। তবে তাদের ভোটাধিকার থাকবে না।	ইউনিয়ন পরিষদের একজন চেয়ারম্যান, ৯ জন সদস্য এবং মহিলাদের জন্য তিনটি সংরক্ষিত আসন ছাড়াও অন্তর্বর্তীকালীন সিদ্ধান্ত হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদে একটি হিসাবরক্ষকের পদ সৃষ্টি করে কম্পিউটার জ্ঞানসম্পন্ন উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে একটি নতুন স্থানীয় সরকার চাকরি কাঠামোর সুপারিশ করা হয়েছে।
দায়িত্ব ও কার্যাবলী	***দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নলিখিত নীতিসমূহের আলোকে করা হয়েছে-*** স্থানীয় ও জনকল্যাণ সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে সীমিত রাখা এলাকার প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি সমতার ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া	***উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নরূপ-*** একটি সার্বিক ইউনিয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা এবং আন্তঃওয়ার্ড উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত ইউনিয়ন হেলথ সেন্টারে স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা	***উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নরূপ-*** মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনে কার্যক্রম গ্রহণ ইউনিয়ন পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নে সহায়তা প্রদান এবং প্রয়োজনে বাস্তবায়ন করা। বিভিন্ন ব্যবসায় ও	***পরিষদের নিম্নরূপ প্রধান কার্যাবলী থাকিবে-*** প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য; জনশৃঙ্খলা রক্ষা; জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পর্কিত সেবা; এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত

ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নে ইস্যুসমূহ	স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন ১৯৯২	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ : স্থানীয় সরকার কমিশন ১৯৯৭	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষমতা ও আয়ের উৎস সম্পর্কিত সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৮	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ কমিটি ২০০৭
	সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে পশ্চাদপদ জনসমষ্টির প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়া	পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং স্যানিটেশন কার্যক্রমের উন্নয়ন সাধন করা গ্রাম পরিষদ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহের রেজিষ্টার হালনাগাদকরণ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা এবং স্থানীয়ভাবে উদ্ধার কার্যক্রমসহ সরকারি রিলিফ কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা	বৃত্তির লাইসেন্স প্রদান জনগণ কর্তৃক ব্যবহৃত রাস্তা ও অন্যান্য উন্মুক্ত স্থানসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এনজিওগুলোর কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান এলাকাধীন সকল সংস্থার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা এবং থানা/ উপজেলা পরিষদকে সে সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান	পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি
ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব	পূর্ণ প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব স্থানীয় প্রয়োজনে করআরোপ, বাজেট প্রণয়ন ও তহবিল সংরক্ষণ স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ইউনিয়ন পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের পর্যালোচনা ও তদারকি করার ক্ষমতা	ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত সকল সরকারি সংস্থাকে ইউনিয়ন পরিষদের আওতাভুক্ত করে এদের কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন পরিষদ ভবনকে কমপ্লেক্সে রূপান্তরিত করে একই স্থানে কর্মকর্তাদের অফিস অবস্থিত হবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যময় এবং গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা এবং কার্যাবলী সময় ও চাহিদ অনুযায়ী পুনর্বিন্যস্ত করা	পূর্ণ প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ, বাজেট প্রণয়ন ও তহবিল সংরক্ষণসহ স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ইউনিয়ন পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কর্মের পর্যালোচনা ও তদারকি করার ক্ষমতা	পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সরকারিভাবে নিয়োগ প্রদান এবং ন্যস্তকৃত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে পরিষদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালনের কথা বলা হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে অধীনস্থ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুতের ক্ষমতা দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে
স্বতন্ত্র ও স্বাধীনতা	স্থানীয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে	ইউনিয়ন পরিষদের কেন্দ্রস্থলে ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ভবন তৈরি		

ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নে ইস্যুসমূহ	স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন ১৯৯২	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ : স্থানীয় সরকার কমিশন ১৯৯৭	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষমতা ও আয়ের উৎস সম্পর্কিত সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৮	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ কমিটি ২০০৭
	নির্দিষ্ট এলাকায় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা ও আর্থিক সংগতি অর্জনের ক্ষমতা অধিকারের স্বীকৃতি জাতীয় সম্পদের ওপর স্থানীয় জনগণের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা	করা হলে সেখানে ইউনিয়ন পরিষদের সভার জন্য মিলনায়তন, চেয়ারম্যান অফিস ছাড়াও ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর অফিসের স্থান থাকবে		
সম্মান ও মর্যাদা	স্থানীয় সরকারের মর্যাদার বৃদ্ধিকল্পে কেন্দ্রের সঙ্গে অধীনস্থ ও নিয়ন্ত্রণমূলক সম্পর্কের স্থলে গড়ে তুলতে হবে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সাধারণ আইন অর্ডিন্যান্স দ্বারা স্থাপন না করে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এর স্থায়িত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের চবৎভড়ৎসধহপব জবঢ়ড়ৎঃ অথবা বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন (অঈজ) লিখবেন। চেয়ারম্যান সহ সকল সদস্য/ সদস্যা এই প্রতিবেদন লেখায় অংশ নেবেন।		
নারীর ক্ষমতায়ন		মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনে কার্যক্রম গ্রহণ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সামাজিক কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ		সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সরাসরি ভোটে নারী সদস্য/ কাউন্সিলরদের জন্য শতকরা ৪০ ভাগ আসন ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে পরবর্তী ৩টি নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ।	পাঁচসালা ইউনিয়ন পরিষদ পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্পগুলি চিহ্নিত হবে এবং প্রতি বছর	ইউনিয়ন পরিষদ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট নির্দেশিকা অনুযায়ী আয়-ব্যয়ের হিসাব	প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকারের নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ,

ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নে ইস্যুসমূহ	স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন ১৯৯২	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ : স্থানীয় সরকার কমিশন ১৯৯৭	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষমতা ও আয়ের উৎস সম্পর্কিত সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৮	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ কমিটি ২০০৭
		এইভাবে প্রস্তুতকৃত পরিকল্পনা বই থেকেই প্রকল্প বাছাই করে বাস্ত বায়নের জন্য গ্রহণ করা হবে। পবিষদ বছরের শেষে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন প্রতিবেদনের কপি ইউনিয়ন পরিষদের প্রকাশ্য স্থানে নোটিশ বোর্ডে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।	সম্পর্কিক বাজেট তৈরি করবে এবং প্রকাশ্য স্থানে জনসাধারণের অবগতি ও মন্তব্যের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে। ইউনিয়ন পরিষদ আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে এবং বছরের শেষে আয়-ব্যয়ের হিসাব অডিট করা হবে। ইউনিয়ন পরিষদের আওতাভুক্ত কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিশ্চিত করা প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। (২৫)	শর্তসমূহ এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার বিবরণ সংবলিত 'নাগরিক সনদ' প্রকাশ করবে, যা প্রতি বছর হালনাগাদ করতে হবে। নতুন আঙ্গিকে স্থানীয় সরকার পরিদর্শন ম্যানুয়াল প্রণয়ন করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিবিড় পরিবীক্ষণসহ নিয়মিত কার্যকরী পরিদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়ার্ড সভা গঠনের মাধ্যমে ওয়ার্ডের সর্বমোট ভোটার সংখ্যার বিশ ভাগের একভাগ উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ করে বছরে কমপক্ষে তিনবার ওয়ার্ড সভা আয়োজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশের (দ্বিতীয় ভাগ) ৯ এবং ১১নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

(৯) 'রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করিবেন এবং সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।'

(১১) 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, সেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।'

চতুর্থ ভাগের ৩য় পরিচ্ছেদের 'স্থানীয় শাসন' শিরোনামের দুটি অনুচ্ছেদ যথাক্রমে ৫৯ এবং ৬০-এ বলা হয়েছে যে,

'৫৯। (১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে। (২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভূক্ত হইতে পারিবে :–

(ক) প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য;

(খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা;

(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তায়ন।'

'৬০। এই সংবিধানের বিধানবলীতে পূর্ণ কার্যকারিতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের এ চারটি অনুচ্ছেদ দেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সকল আইন-কানুন প্রণয়নের উৎস। তবে এখানে দুটি বিষয় স্মরণযোগ্য (১) সংবিধানের এ চারটি অনুচ্ছেদে 'স্থানীয় সরকার' নামক কোন শব্দ বা শব্দাবলী নেই। আছে 'স্থানীয় শাসন' এবং 'স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান'। (২) সংবিধান প্রণীত হওয়ার আগে থেকে এদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এ সম্পর্কিত আইন ও বিধান ছিল।

বাংলাদেশে সাংবিধানিক অবকাঠামোর আলোকে একটি কার্যকর ও গতিশীল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার গুরুত্ব দিয়েছে।

২০০৯ সালের ১৫ অক্টোবর জাতীয় সংসদে এ লক্ষ্যে বহুল প্রত্যাশিত স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ পাস হয়েছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি উন্নত ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন আইন প্রণয়নের জন্য সংসদীয় কমিটিকে সকলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। একই সঙ্গে প্রথমবারের মতো সংসদে আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ পাস হওয়ায় স্থানীয় সরকারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর ইউনিয়ন পরিষদ তৃণমূলে জনগণকে সেবা প্রদানে আরো গতিশীল ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে সকলেরই প্রত্যাশা। আইনটির বিভিন্ন দিক নিয়ে স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞ মহলে আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে। তবে লক্ষণীয় যে, আইনটি পাশ হওয়ার পর এক বছর অতিবাহিত হলেও মাঠ পর্যায়ে এর তেমন কোন কার্যকর প্রতিফলন দেখা যায়নি।

মাঠ পর্যায়ে আইনটির বাস্তবায়ন/প্রয়োগের অগ্রগতি পর্যালোচনার উদ্দ্যেশে ডেমক্রেসিওয়াচ দেশের ৬টি বিভাগের মোট ২৮টি ইউনিয়নে একটি জরিপ পরিচালনা করে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অধিক গতিশীল ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গঠনে ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯-এর বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা। উক্ত গবেষণার মাধ্যমে যৌক্তিক, কার্যকর ও বাস্তবভিত্তিক ইউনিয়ন পরিষদ বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণা পরিচালনায় দুইটি ধাপে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। যথা :

১. প্রাথমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য ও

২. মাধ্যমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত মাধ্যমিক তথ্য

প্রাথমিক তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

নির্ধারিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে মতামত জরিপ নেয়া হয়, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা এলাকা

বাংলাদেশের ৬টি বিভাগে মোট ২৮টি ইউনিয়ন পরিষদে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

নমুনায়ন ও নমুনার আকার

উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতির (purposive sampling method) মাধ্যমে উত্তরদাতাদের মধ্যে নির্দিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যানকে উত্তরদাতা চিহ্নিত করা হয়েছে।

তথ্যসংগ্রহ ও বিশেষণ পদ্ধতি

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯-এর বাস্তবায়ন পর্যালোচনার মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য ৬ জন দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণকে এই গবেষণার জন্য নিয়োগ করা হয়। সহজে অনুধাবনের জন্য প্রশ্নপত্র বাংলা ভাষায় তৈরি করা। সাক্ষাৎকার অনুসূচির মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উপরন্তু অন্যান্য গবেষণা ও স্থানীয় সরকার কমিশনের প্রতিবেদন তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

২৮ মার্চ ২০১০ থেকে ৬ এপ্রিল ২০১০ সময়কাল পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্তসমূহকে যথাযথ বিশেষণের জন্য তথ্য কোডিং করে কম্পিউটারে নিবন্ধন করা হয়। এরপর তথ্য বিশেষণ করা হয়।

গবেষণার যৌক্তিকতা

ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ ২০০৯ অনুযায়ী ইউপির কাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন এসেছে। নতুন আইনের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হওয়ার ফলে কাজগুলো কিভাবে সম্পাদন করতে হবে এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা প্রয়োজন । এ বর্ণনাগুলো সরকারি পরিপত্র আকারে ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে পাঠানো হয়। যার ফলে ইউনিয়ন পরিষদেগুলো কাজে গতিশীলতা আসে। ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিদের চেয়ারম্যানদের ধারণা কতটুকু এবং মাঠ পর্যায়ে এর বাস্তবায়ন কতটুকু। এ লক্ষ্যেই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এ গবেষণায় যে নমুনা আকার নেয়া হয়েছে সময় ও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে ৪,৪৯৮টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে শুধু ২৮টি ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে এবং ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য ও কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে এ জরিপের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে স্থানীয় সরকার বিবর্তনের ইতিহাস

স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বাংলাদেশের রাজনীতি তীব্র চাপের মুখে পড়ে। শাসন পদ্ধতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আসে।

মুজিব শাসন আমল ১৯৭২ সালে জারি করা রাষ্ট্রপতির ৭নং আদেশ দ্বারা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার বিদ্যমান সকল স্থানীয় সরকার কমিটি ভেঙে দেয়। এসব অবলুপ্ত কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার কিছু কমিটি নিয়োগ করে। অধিকন্তু ইউনিয়ন কাউন্সিল ও জেলা কাউন্সিল যথাক্রমে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত (পরবর্তী সময়ে ইউনিয়ন পরিষদ) ও জেলা বোর্ডে (পরবর্তী সময়ে জেলা পরিষদ) রূপান্তরিত হয়। অবশ্য থানা কাউন্সিল ও বিভাগীয় কাউন্সিলের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো কমিটি নিয়োগ করা হয়নি। ১৯৭২ সালের সংবিধানের স্থানীয় সংস্থার মৌলিক কাঠামো ও কার্যাবলী সম্পর্কিত বিধান সংযোজন করা হয়। বিশেষ করে সংবিধানের ৯নং অনুচ্ছেদে বিধান রাখা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে প্রতিটি প্রশাসনিক ইউনিটে স্থানীয় সংস্থা গঠন করা যায়।

১৯৭৩ সালে নতুন করে জারি করা রাষ্ট্রপতির আদেশের (আদেশ নং ২২) অধীনে গঠিত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাষ্ট্রপতির ওই আদেশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে, কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত একটি ইউনিয়ন পরিষদ তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত হবে এবং প্রত্যেক ওয়ার্ডে তিনজন করে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হবে, অর্থাৎ একটি ইউনিয়নে মোট ৯ জন সদস্য নির্বাচন করা হবে। তাছাড়া এ আদেশে ইউনিয়নের সকল ভোটারের সরাসরি ভোটে চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন করার বিধান রাখা হয়েছিল। অনুরূপভাবে থানা ও জেলা উভয় পর্যায়ে পদাধিকার বলে যথাক্রমে মহকুমা প্রশাসক এবং ডেপুটি কমিশনারকে চেয়ারম্যান করার বিধান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর ভিত্তিতে ১৯৭৫ সালের ৭ জুন আইন বৈধ একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে বাকশালের চেয়ারম্যান হিসেবে রাষ্ট্রপ্রতি শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় দলের জন্য ১৫ সদস্যের একটি নির্বাহী কমিটি এবং ১১৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি মনোনীত করেন। বাকশালের একটি বড় লক্ষ্য ছিল দেশে প্রভাবশালী আমলাতন্ত্রের সংস্কার সাধন। নতুন ব্যাবস্থায় পুনর্গঠিত আমতন্ত্রকে দুটি ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো হয়েছিল। এর একটি ছিল জাতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং অপরটি জেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক কাউন্সিল। এই

ব্যবস্থায় বিদ্যমান প্রতিটি মহকুমাকে একজন নির্বাচিত গভর্নরের অধীনে জেলায় রুপান্তরের বিধান রাখা হয়। এ ক্ষেত্রেও ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে ব্যাপক ধরনের প্রভাব পরে।

জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে ১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ জারি হয়। এতে তিন ধরনের গ্রামীণ স্থানীয় সরকার গঠনের বিধান রাখা হয়, যথা : ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী বলতে গেলে ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ২২নং অধ্যাদেশের অনুরূপই থেকে যায়। তবে ব্যতিক্রম শুধু ভাইস চেয়ারম্যানের পদের বিলুপ্তি এবং দুই ধরনের অতিরিক্ত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের সংযোজন। যেমন, দুইজন মনোনীত মহিলা সদস্য এবং দুইজন মনোনীত কৃষক সদস্য। ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদকাল পাঁচ বছর নির্ধারিত ছিল। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের যোগ্যতা, তাদের অপসারণ প্রক্রিয়া এবং একইভাবে ইউপি কার্যক্রম কি হবে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ব্যাপক মাত্রায় আরোপিত হয়। যেমন নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মহকুমা প্রশাসক ইউনিয়ন পরিষদের যে কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। ৪০টি কার্যক্রম এই পরিষদের প্রধান কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এদের মধ্যে প্রধান হলো জনকল্যাণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, রাজস্ব সংগ্রহ, উন্নয়ন ও বিচার। কিন্তু এর রাজস্ব উৎস সরকারি অনুদান, ট্যাক্স ও ফি ইত্যাদি ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশের মতো প্রায় একই রকম রয়ে যায়।

১৯৮২ সালে হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকার প্রশাসনিক পুনর্গঠনের জন্য ১০ সদস্যের কমিটি গঠন করে। সরকার কমিটির সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে বিশেষত থানা পর্যায়ে বিদ্যমান স্থানীয় সংস্থার পুনর্বিন্যাসের বড় ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৮২ সালের ২৩ ডিসেম্বর স্থানীয় সরকার (থানা পরিষদ এবং থানা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ ঘোষণা করা হয়। অধ্যাদেশের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিরাট পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং উপজেলা পর্যায়ে বড় ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কর, ফি, টোল, রেট ইত্যাদি আরোপ করাসহ ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সার্বিক দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে যার ফলে ইউনিয়ন পরিষদ আরেকদফা কর্তৃত্বহীন হয়ে পরে।

বিএনপি প্রথম (১৯৯১-৯৬) শাসন আমলে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার যথাযথ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকভাবে প্রণীত বিকেন্দ্রীকৃত কাঠামোর পরিবর্তন না করেই উপজেলা ব্যবস্থা ও কাঠামো ভেঙে দেয়। ১৯৮৩ সালের

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে নতুন ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু অন্যান্য উচ্চতর ক্ষেত্রে স্থানীয় সংস্থা গঠনের লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত ১৯৯২ সালে সংসদে একটি বিল উত্থাপন করা হয়। ২৪ নভেম্বর ১৯৯১ সালে স্থানীয় সরকারসমূহের কাঠামোর কার্যকারিতা পর্যালোচনা, বিশেষ করে বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর আলোকে স্থানীয় সরকারসমূহের কাঠামো পুনর্বিন্যাস সম্পর্কিত সুপারিশ পেশ করার জন্য কমিশন গঠন করেছিল। কমিশন ৩০ জুলাই ১৯৯২ সালে পল্লী এলাকায় দুই স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সুপারিশ করে। প্রথম স্তর হলো, গ্রামভিত্তিক ইউনিয়ন পরিষদ এবং দ্বিতীয় স্তরে জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ। এই কমিশন গ্রাম সভার গঠনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে জবাবদিহি ও কার্যকর করার সুপারিশ প্রদান করে।

আওয়ামী লীগ শাসন আমলে (১৯৯৬-২০০১) শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার স্থানীয় গণতান্ত্রিক নীতির ওপর ভিত্তিশীল টেকসই একটি স্থানীয় সংস্থার সুপারিশ প্রণয়নের জন্য স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করে। সে অনুযায়ী কমিশন ৪ স্ত রবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার গঠনের সুপারিশ করে। যেমন : গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ। আওয়ামী লীগ শাসন আমলে ইউনিয়ন পর্যায়ে সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচন ব্যতীত কমিশনের আর তেমন কোনো সুপারিশ বাস্তবায়ন করেনি।

দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হয়ে (২০০১-০৬) হয়ে বিএনপি স্থানীয় সরকার বিষয়ে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অনেকে এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের অসহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে স্থানীয় শাসন নিশ্চিত করার অঙ্গীকার থাকলেও ক্ষমতাসীন হয়ে এর বাস্তবায়ন ঘটানোর কোনো নিদর্শন দেখা যায়নি।

ফলাফল

বেশিরভাগ ইউনিয়ন পরিষদ এখনও ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ পায়নি এবং সরকার থেকে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি বলে জানায়। তারা নতুন একটি আইন হয়েছে, তা জানেন। কিন্তু এর সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানেন না।

ইউনিয়ন পরিষদে জনঅংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯-এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদে ওয়ার্ড সভা গঠন এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে উন্মুক্ত সভা অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও ৪২.৮৬% ইউনিয়ন পরিষদ এখনও ওয়ার্ড সভা গঠন করেনি এবং তারা জানান সরকারের কাছ থেকে এ সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা পাননি। ৫৭.১৪% ওয়ার্ড সভা গঠন করলেও তা এলজিএসপির আওতায়। এই ওয়ার্ড সভাগুলোতে ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯-এর প্রতিফলন ঘটেনি। এ ছাড়াও ৫৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অর্থবছর শুরু হওয়ার ৬০ দিন আগে এবং ওয়ার্ড সভা থেকে প্রাপ্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়নের কথা উল্লেখ করা হলেও এবছর ইউপিগুলো তা করতে পারেনি এবং ব্যাপারটি সম্পর্কে জানেন না।

সারণী : ১

	%
ওয়ার্ড সভা গঠন করা হয়নি	৪২.৮৬
এলজিএসপির আওতায় গঠন করা হয়েছে	৫৩.৫৭
ওয়ার্ড সভা করেন তবে ইউপি আইন ২০০৯ অনুযায়ী নয়	৩.৫৭

অর্ধেকের বেশি (৫৭.১৪%) ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড পর্যায়ে উন্মুক্ত সভা করলেও তা বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯-এর আলোকে করা হয়নি। এলজিএসপির আওতায় যেভাবে ওয়ার্ড সভা করার কথা সেভাবে করেছেন। যারা (৪২.৮৬%) এলজিএসপির আওতায় নেই, তারা ওয়ার্ড পর্যায়ে উন্মুক্ত সভা করেননি। যারা ওয়ার্ড সভার আয়োজন করেছেন তাদের (৪২.৮৫%) সভা আয়োজনের সাতদিন আগে নোটিশ জারি করেছেন। ১৪.২৮% সভা আয়োজনের তিনদিন আগে নোটিশ দেন। বেশিরভাগ ইউনিয়ন পরিষদ জানায়, সরকারের কাছ থেকে কোন ধরনের নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। ইউনিয়ন পরিষদের আইন অনুসারে ওয়ার্ড সভা না করার প্রধান কারণ ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ সম্পর্কে অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদ এখনও কিছুই জানে না। শুধু জানে ইউনিয়ন পরিষদের একটি নতুন আইন হয়েছে। যারা জানে, তারা এখনও সরকারের কাছ থেকে তারা কোন পরিপত্র পাননি।

যারা এলজিএসপির আওতায় সভা করেছেন, তারা সভায় কি কি বিষয়ে আলোচনা করা হয় এর উত্তরে ৩৫.৭২% বলেছেন, অবকাঠামোগত উন্নয়নের অগ্রগতি এবং

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১০.৭১% বলেছেন, তারা চলমান ও ভবিষ্যত প্রকল্প গ্রহণ বিষয়ে আলোচনা করেন। ১০.৭১% জানান, তারা অগ্রগতি এবং পরিকল্পনা বিষয়ে শেয়ার করেন এবং বরাদ্দকৃত কাবিখা, টেস্টরিলিফ বিষয়ে আলোচনা করেন।

ইউনিয়ন পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ২৮টি ইউনিয়নের সব কটি জানায়, তারা প্রতি মাসে ইউনিয়ন পরিষদের সভা আয়োজন করেন। সভা আয়োজনের জন্য তারা নোটিশ করেন এবং অফিস সময়ের মধ্যেই আয়োজন করেন। সভায় যারা উপস্থিত থাকেন এর উত্তরে ৫০% ইউপি জানায়, তাদের সভায় নিয়মিত ইউপি সদস্য, এনজিও ও সরকারি কর্মকর্তা উপস্থিত থাকেন। ২৫% ইউপি বলেছে, তাদের সভায় কোন সরকারি কর্মকর্তা বা এনজিও প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন না । ২৫% বলেছে, তাদের মাসিক সভায় কর্মকর্তা বা এনজিও প্রতিনিধি মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকেন।

সারণী : ২

	%
ইউপি সদস্য, এনজিও ও সরকারি কর্মকর্তা উপস্থিত থাকেন	৫০.০০
ইউপি সদস্য ও সচিব উপস্থিত থাকেন	২৫.০০
সদস্য ছাড়াও গণ্যমান্য ব্যক্তি, সরকারি কর্মকর্তা মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকেন	২৫.০০

সেবা প্রদানে ইউনিয়ন পরিষদকে আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে এই আইনের ৪৯ অনুচ্ছেদে নাগরিক সনদ বা সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করার কথা বলা আছে অথচ দীর্ঘ ১৪ মাস অতিবাহিত হলেও ৭১.৪৪% ইউপি এখনও নাগরিক সনদ বা সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করেনি বা প্রকাশের কোন উদ্যোগ নেননি। সিটিজেন চার্টার কি এ সম্পর্কে ইউনিয়নগুলোর ধারণা স্পষ্ট নয়। মাত্র ১৭.৮৫% ইউপি নিজ উদ্যোগে বা কোন এনজিওর সহায়তায় সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করেছেন। ১০.৭১% ইউনিয়ন সিটিজেন চার্টার প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন।

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে আইনের ৫০ অনুচ্ছেদে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। বাস্তবে গবেষণা থেকে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইউপিগুলোর যে চিত্র পাওয়া যায় তাহলো, ৬৭.৮৫% ইউপিতে কমপিউটার আছে কিন্তু এই কমপিউটার ব্যবহারের জন্য দক্ষ জনবল নেই, মাত্র ৩.৫৭% ইউপি বলেছেন তারা কম্পিউটারে তাদের ইউপির ডাটাবেজ সংরক্ষণ করেন এয়াড়া ২৮.৫৮% ইউপি জানান তাদের ইউপিতে কোন কমপিউটার নেই।

ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯-এর ৮নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে এই আইনের অধীনে ঘোষিত প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে , সংবিধানের ১৫২(১) অনুচ্ছেদের সহিত পঠিতব্য ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রশাসনিক একাংশ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এছাড়াও ৬৩ অনুচ্ছেদ এবং তৃতীয় তফসিলে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তরের কথা বলা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তা বা ইউপি সদস্যদেও সাথে আলাপ কওে জানা যায় তারা এ সম্পর্কিত কোন পরিপত্র সরকারের কাছ থেকে পাননি। ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী, ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে তাদের দাপ্তরিক কার্যক্রম করেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে ইউপিগুলোর ৩৫.৭২% জানান সরকারি কর্মকর্তারা মাঝে মাঝে আসেন। ৩২.১৪% ইউপি বলেন ভবন না হওয়ার কারণে সরকারি কর্মকর্তারা বসেন না । ১৭.৮৬% জানান কিছু কিছু সরকারি কর্মকর্তা ইউপিতে নিয়মিত বসেন। ১৪.২৮% জানান তাদের ইউপিতে কখনও কোন সরকারি কর্মকর্তা বসেন না। ইউনিয়ন পরিষদগুলো পরিদর্শনকালে তারা জানান শুধুমাত্র উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ছাড়া কেউ উপস্থিত থাকেন না । কোন কোন ক্ষেত্রে মৎস্য ও পশু সম্পদ কর্মকর্তাকে ইউপিতে বসতে দেখা গেছে। ইউনিয়ন পরিষদে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ৮টি রুম রয়েছে, তা ছাড়া দেখা যায় একটি উপজেলায় যতগুলো ইউনিয়ন আছে সরকারি কর্মকর্তার সংখ্যা সে তুলনায় অনেক কম ফলে প্রতিটি ইউনিয়নে সরকারি কর্মকর্তা অবস্থান করা সম্ভব নয়।

এছাড়াও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কমিটিতে সরকারি কর্মকর্তাদের কমিটির সভাপতির দ্বায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এতে সংবিধানের ১৫২(১) অনুচ্ছেদের সহিত পঠিতব্য ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রশাসনিক একাংশ বলিয়া ঘোষণা করা হয়েছে তার পরিপন্থী হয়েছে।

জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইনে ৭৮ অনুচ্ছেদে তথ্য প্রাপ্তির বিধান রাখা হয়েছে। যার ফলে জনগণ সামান্য কিছু রাষ্ট্রীয় গোপনীয় তথ্য ব্যতীত বাকি সব ধরণের তথ্য ইউনিয়ন পরিষদ থেকে পেতে পারে। গবেষণায় দেখা যায়, ৪৬.৪২% ইউপির কাছে জনগণ তথ্য চাইলে তারা তথ্য দেন। ২৮.৫৮%। ইউপি এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ২৫% ইউপি জানায়, জনগণ তাদের কাছে তথ্য নিতে আসে না।

উল্লেখ্য, ইউনিয়ন পরিষদ তথ্য চাওয়া ও সরবরাহের পদ্ধতি, ফি ইত্যাদি বিষয়ে এখন পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে কোন দিকনির্দেশনা পায়নি। তাছাড়া জনগণও তাদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। এছাড়া কি কি তথ্য ইউনিয়ন পরিষদ জনগণকে দিতে পারবে– এ ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনাও সরকারের কাছ থেকে পায়নি বলে ইউনিয়ন পরিষদগুলো জানায়।

সারণী : ৩

	%
জনগণ তথ্য চাইলে আমরা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তথ্য দেয়ার ব্যবস্থা করি	৪৬.৪২
কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি	২৮.৫৮
জনগণ তথ্য নিতে আসেনি	২৫

নতুন আইনের দশম অধ্যায়ের ৫৭ অনুচ্ছেদে ওয়ার্ড সভা থেকে প্রাপ্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়নের কথা থাকলেও সে অনুযায়ী ওয়ার্ড সভা করা হয়নি তবে এলজিএসপির আওতায় ওয়ার্ড সভা করা হয় এবং তার ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়ন করা হয় বলেছেন ৫৩.৫৭% ইউপি, ২৫% ইউপি বলেছেন তারা এ ধরনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি, ২১.৪৩% ইউপি বলেছেন তারা এ ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন।

ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯-এর পঞ্চদশ অধ্যায়ের ৮২ অনুচ্ছেদে ইউনিয়নে অবস্থিত টিউটোরিয়াল স্কুল, প্রাইভেট হাসপাতাল, কোচিং সেন্টার ইত্যাদির নিবন্ধনের কথা বলা হয়েছে। জরিপে দেখা যায়, ৭৮.৫৮% ইউপিতে এখনও নিবন্ধন কাজ শুরু হয়নি, ১৪.২৮% ইউপি নিবন্ধনের পরিকল্পনা নিয়েছেন। মাত্র ৭.১৪% ইউপি ইতোমধ্যে নিবন্ধন শুরু করেছেন। সরকার ইউনিয়ন পরিষদকে স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে করের আওতা বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা ইউনিয়ন পরিষদকে না দেয়ায় তারা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর কি ধরনের কর আরোপ করবেন তা জানে না।

ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯-এর চতুর্থ তফসিলে ইউনিয়নের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইমারত পরিকল্পনা অনুমোদন ফি এবং নিকাহ নিবন্ধন ফি নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ইউপিগুলোর ৬৪.২৯% জানায়, এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ৩৫.৭১% জানায়, সরকারের কাছ থেকে ফি'র হার এবং আদায় পদ্ধতি সম্পর্কে কোন নির্দেশনা পাওয়া যায়নি।

ইউনিয়ন পরিষদকে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করার জন্য যে আইনটি প্রণীত হয়েছে, **গত ১৪ মাসেও** সরকার তা ইউনিয়ন পরিষদে পৌঁছাতে পারেনি। গবেষণা থেকে জানা যায়, ৪২.৮৬% ইউপি এখনও এই আইনটি হাতে পায়নি। ২৮টি ইউনিয়নের ৪৬.৪২% যদিও এই আইনটি পেয়েছে, কিন্তু তারা সরকারের কাছ থেকে পায়নি, পেয়েছে বিভিন্ন এনজিওর কাছ থেকে। ১০.৭২% ইউপি তাদের সংগঠন বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম (বিইউপিএফ) থেকে সংগ্রহ করেছে।

ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ ও ইউনিয়ন পরিষদ আইন ১৯৮৩-এর তুলনামূলক আলোচনা

ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯	ইউনিয়ন পরিষদ আইন ১৯৮৩
ধারা ৪ (১) এ ওয়ার্ড সভা গঠনের কথা বলা হয়েছে যা পরিষদকে গণমূখী প্রতিষ্ঠানে পরিনত করতে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে আমরা মনে করি। ধারা ৫ (১) এ বছরে কমপক্ষে ২টি ওয়ার্ড সভা এবং ৫ (২) এ সর্বমোট ভোটার সংখ্যার ২০ ভাগের ১ ভাগ দ্বারা সভার কোরাম পূর্ণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	ইউনিয়ন পরিষদ আইন ১৯৮৩ সালের আইনটিতে ওয়ার্ড সভা গঠনের কথা ছিল না ফলে ইউনিয়ন পরিয়দের সকল সিদ্ধান্ত ইউনিয়ন পরিষদ একাই নিত। এর ফলে ইউনিয়ন পরিষদের কাজে জনগণের মতের কোন প্রতিফলন থাকত না।
এ আইনের অধীনে ঘোষিত প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে, সংবিধানের ১৫২(১) অনুচ্ছেদের সহিত পঠিতব্য ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এতদ্বারা প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক একাংশ বলিয়া ঘোষণা করা হইল।	১৯৮৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ আইনে ইউনিয়ন পরিষদকে প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক একাংশ বলিয়া ঘোষণা করা হয় নাই।
ধারা ১৮-তে নতুন ঘোষিত ইউনিয়নে নির্বাচিত পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসক নিয়োগের ১২০ দিন সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়ায় এ বিষয়ে অস্পষ্টতা দূর হয়েছে।	১৯৮৩র আইনে প্রশাসক যতদিন পর্যন্ত অত্র অধ্যাদেশের বিধানাবলী মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা না হয় ততদিন দ্বায়িত্ব পালন করিবেন।
ধারা ২৩ (৩) (৪) (৫) এ নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগ ১৮০ দিনের মধ্যে নিস্পত্তির বিধান করা হয়েছে যা স্বল্প সময়ে নির্বাচনী বিরোধ নিস্পত্তিতে ভূমিকা রাখবে।	১৯৮৩র আইনে এ ধরনের কোন সময়সীমা নির্ধারণ করা না থাকায় দীর্ঘকাল ধরে নির্বাচন সংক্রান্ত মামলা চলত।
ধারা ৩৪ (১) এ শুধুমাত্র আদালত কর্তৃক ফৌজদারি মামলায় অভিযোগপত্র গৃহীত অথবা অপরাধ আদালত কর্তৃক আমলে নেয়ার ভিত্তিতে চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের সাময়িক বরখাস্তের বিধান করা হয়েছে।	১৯৮৩ এর আইন অনুযায়ী ফৌজদারি মামলা শুরু হলে ১২(১) ধারা মোতাবেক এবং সরকারের মতামত সাপেক্ষে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন তাহলে উক্ত চেয়ারম্যানকে সাময়িক বরখাস্ত করতে পারবেন।
ধারা ৪৯ (১)-এ গঠিত প্রতিটি পরিষদ, নির্ধারত পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন সেবা প্রদানের বিবরণ, সেবা প্রদানের শর্তসমূহ এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করিবার বিবরণ প্রকাশকরিবে যাহা নাগরিক সনদ (Citizen Charter) বলিয়া অভিহিত হইবে।	১৯৮৩ এর আইনে নাগরিক সনদ বলে কোন কিছু ছিল না।
ধারা ৬৩ (১) নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে পরিষদের সাধারণ বা বিশেষ কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলী নির্ধারিত সময়ের জন্য পরিষদে হস্তান্তর করিতে পারিবে, উক্তরূপে হস্তান্ত	১৯৮৩ এর আইনে সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে নির্ধারিত সময়ের জন্য পরিষদে হস্তান্তর করা যেত না।

রিত কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণ সংশ্লিষ্ট পরিষদের ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব পালন করিবেন	
ধারা ৬৫ (৪)-এ করের পরিধি বাড়ানো হয়েছে। বিশেষত চতুর্থ তফসিলে ভূমি উন্নয়ন ফি, নিকাহ নিবন্ধন ফি, ইমারত পরিকল্পনা অনুমোদন ফি থেকে ইউপি'র রাজস্ব সংগ্রহের সুযোগ তৈরি হয়েছে।	১৯৮৩ এর আইনে নিকাহ নিবন্ধন ফি, ইমারত পরিকল্পনা অনুমোদন ফি ছিল না।
ধারা ৭৮ (১)-এ প্রচলিত আইনের বিধান সাপেক্ষে, বাংলাদেশের যে কোন নাগরিকের পরিষদ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য, নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাপ্তির অধিকার থাকিবে।	১৯৮৩ এর আইনে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তথ্য প্রদানের বিষয়টি ছিল না।
ধারা ৮২ (১) এবং ৮৩ (১) এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ বা তৎপরবর্তীতে পরিষদ এলাকায় পরিষদের নিবন্ধন ব্যতীত বেসরকারিভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার এবং প্রইভেট হাসপাতাল চালু করা যাইবে না; উক্ত রূপ নিবন্ধনের জন্য নিধারিত পদ্ধতিতে পরিষদের চেয়ারম্যান বরাবরে আবেদন করিতে হইবে এবং উক্তরূপ আবেদন প্রাপ্তির পর পরিষদ প্রয়োজনীয় তদন্ত করিয়া সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে পরিষদ সভায় অনুমোদনক্রমে নিবন্ধনের অনুমতি প্রদান করিবে।	১৯৮৩ এর আইনে এ সকল প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের কোন ব্যবস্থা বা প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

এ আইনের ভালো দিকগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো :

১. ধারা ৪ (১)-এ ওয়ার্ড সভা গঠনের কথা বলা হয়েছে যা পরিষদকে গণমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে আমরা মনে করি। ধারা ৫ (১)-এ বছরে কমপক্ষে ২টি ওয়ার্ড সভা এবং ৫ (২)-এ সর্বমোট ভোটার সংখ্যার ২০ ভাগের ১ ভাগ দ্বারা সভার কোরাম পূর্ণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

এতে একদিকে যেমন ইউনিয়ন পরিষদ অংশগ্রহণমূলক এবং স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে অন্যদিকে জনগণের ক্ষমতায়ন এবং অধিকার রক্ষায় সহায়ক হবে।

২. ধারা ৮ এ ইউনিয়ন পরিষদকে প্রশাসনের একাংশ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে যা সংবিধানে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার চেতনাকে পূর্ণতা দিয়েছে। আমরা এই ঘোষণাকে স্বাগত জানাই। পাশাপাশি ধারা ১০ এর (৭)-এ বর্ণিত ইউনিয়নে কর্মরত সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপর ইউনিয়ন পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্পণ করার বিধান ও সংবিধানের ৫৯ ধারা বাস্তবায়নের প্রতিফলন ঘটেছে।

তৃণমূলে সরকারি সেবা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে এই বিধান কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা আশাবাদী। একাদশ অধ্যায়ে ধারা ৬৪-তে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের সম্পর্ক বিষয়ে যে আচরণবিধি প্রণয়ন করার কথা বলা হয়েছে তা এর মাধ্যমে পূর্ণতা পাবে বলে আমরা মনে করি।

৩. ধারা ১৮-তে নতুন ঘোষিত ইউনিয়নে নির্বাচিত পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসক নিয়োগের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়ায় এ বিষয়ে অস্পষ্টতা দূর হয়েছে।

৪. ধারা ৪৯-এ নাগরিক সনদ প্রকাশের যে বিধান রাখা হয়েছে তা প্রশংসনীয়।

এর ফলে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে জনগণ কি কি সেবা পাবে সে ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করবে। তবে তথ্য হালনাগাদ করা এবং কারিগরি সহায়তার জন্য অর্থ সংস্থানের বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট করে সত্ত্বর নির্দেশিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

৫. তথ্য প্রাপ্তির অধিকার (চতুর্দশ অধ্যায়)

ধারা ৭৮-এ তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি মাইলফলক উদ্যোগ।

তথ্য চাওয়ার ও পাওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬. ধারা ৮২ এবং ৮৫-তে টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল ইত্যাদি নিবন্ধিকরণের এবং বাৎসরিক ফি আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

এটি ইউনিয়ন পরিষদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

৭. ধারা ১০৭ এ চেয়ারম্যান, সদস্যদের জনসেবক (Public Servant) হিসেবে গণ্য করা হয়েছে হয়েছে।

এর মাধ্যমে যে চেতনা নিয়ে তারা জনপ্রতিনিধি হন তার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

৮. ধারা ২০ (২)-এ নির্বাচনী দন্ডবিধি/ আচরনবিধি ভঙ্গ এবং নির্বাচনী অপরাধের শাস্তি ও দণ্ড নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যা অবাধ ও সুষ্ঠ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি ধারা ২৩ (৩) (৪) (৫)-এ নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগ ১৮০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির বিধান করা হয়েছে যা স্বল্প সময়ে নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তিতে ভূমিকা রাখবে।

(অতীতে এ ধরনের অভিযোগগুলো বছরের পর বছর ঝুলে থাকতো এবং অভিযোগকারী সুষ্ঠু বিচার পেতো না)

এ আইনের খারাপ দিকগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো :

১. ধারা ৩৪ (১) এ শুধুমাত্র আদালত কর্তৃক ফৌজদারি মামলায় অভিযোগপত্র গৃহীত অথবা অপরাধ আদালত কর্তৃক আমলে নেয়ার ভিত্তিতে চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের সাময়িক বরখাস্তের বিধান করা হয়েছে।

*এই ধারার ফলে স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারণে (*Confect of interest*) আইনের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অহেতুক হয়রানি এবং পরিষদের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় এই ধরনের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব অতীতে অপব্যবহার হয়েছে।*

২. ধারা ২৬ (২) এ প্রার্থীর অযোগ্যতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। তবে ধারা (ঙ)-তে উল্লিখিত প্রজাতন্ত্র বা পরিষদের বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মে লাভজনক সার্বক্ষণিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির নির্বাচনে অযোগ্যতা হারাবেন।

বিষয়টি স্থানীয় পর্যায়ে কোন দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে যায় কিনা বিষয়টি ভেবে দেখা যেতে পারে।

বাংলাদেশে জনগণের সবচাইতে কাছের প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদকে কার্যকর, শক্তিশালী এবং গণমুখী করতে জনপ্রতিনিধি, উন্নয়ন কর্মী এবং বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ তুলে ধরা হলো :

১. আমরা সংবিধান এবং স্থানীয় সরকারের স্বাতন্ত্রের পরিপন্থী নির্দেশনা বা পরিপত্র জারি থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে গণতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক সরকারগুলো এ ধরনের আইনের অপপ্রয়োগ করেছে।

২. সত্ত্বর ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে বিধিসমূহ যেমন, চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী; সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্যদের ক্ষমতা ও বিশেষ কার্যাবলী, তহবিল ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ, কর বিধি, বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন-অনুমোদন-বাস্তবায়ন ছাড়াও প্রয়োজনীয় সকল বিধি প্রণয়ন করতে হবে। একই সঙ্গে যত শিগগির সম্ভব ওয়ার্ড সভা, নাগরিক সনদ প্রকাশ, ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ-বাজেট প্রণয়ন-অনুমোদনের পদ্ধতি ও সময়সীমা নির্ধারন, তথ্য প্রাপ্তির অধিকার বাস্তবায়নে তথ্য চাওয়া ও সরবরাহের পদ্ধতি-নির্ধারিত ফরম-ফি, টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ, ইমারত

পরিকল্পনা অনুমোদন ফি এবং নিকাহ নিবন্ধন ফির হার/পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করার উদ্যোগ নিতে হবে। তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন বিধি বা প্রজ্ঞাপনসমূহ কোন অবস্থাতেই ইউপির ক্ষমতায়নের পরিপন্থী না হয়।

৩. ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনায় বিদ্যমান আইন, অধ্যাদেশ, বিধি, নীতিমালা এবং জনগুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রজ্ঞাপনসমূহ জাতীয় প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় জনগণকে অবহিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসন, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে সরকারিভাবে স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. ইউনিয়ন পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে ইউনিয়ন পরিষদ আইন প্রেরণ এবং এ বিষয়ে ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. ইউনিয়ন পরিষদসহ মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের যথাশিগগির সম্ভব নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. একটি স্বাধীন ও পর্যাপ্ত ক্ষমতা সম্পন্ন স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন এবং তার অধীনে স্থানীয় সরকার পরিচালনা ও তদারকির উদ্যোগ নিতে হবে।

পরিশেষে জরিপ থেকে একটি জিনিস প্রতীয়মান হয় যে, 'ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯' আইনটি বেশকিছু দিন আগে পাস হলেও এখন পর্যন্ত সরকার আইনটি ইউনিয়ন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। ফলে যে আশা ও উদ্দেশ্য নিয়ে এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল, তা ব্যর্থ হতে চলেছে।

এছাড়া বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম এবং গভর্নেন্স অ্যাডভোকেসি ফোরাম এই ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯-এর পর্যালোচনা করেছে নিচে তা দেয়া হলো: বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার বিগত সংসদ অধিবেশনে ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ পাস করেছে। উক্ত আইনটি মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ১৫ অক্টোবর অনুমোদন করেছেন। ১০৮টি ধারা সমন্বিত নতুন এই আইনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে দেশের স্থানীয় সরকার বিশ্লেষক, সুশীল সমাজ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করেছেন। পাসকৃত এই আইনটি সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেও ছিল ব্যাপক আগ্রহ। বিভিন্ন আলোচনা এবং পর্যালোচনা থেকে এই আইনের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলো উপস্থাপন করা হলো

বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম

১। ধারা ৪

ওয়ার্ড সভা- (১) এই আইনের অধীন ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি ওয়ার্ড সভা গঠন করিতে হইবে।

ধারাটি এই আইনের একটি ইতিবাচক দিক। এর ফলে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের কাছে ইউনিয়ন পরিষদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হবে।

২। ধারা ৮

ইউনিয়নকে প্রশাসনিক একাংশ ঘোষণা । এই আইনের অধীন ঘোষিত প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে, সংবিধানের ১৫২(১) অনুচ্ছেদের সহিত পাঠিতব্য ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এতদ্বারা প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক একাংশ বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

এই ধারার ফলে ইউনিয়ন পরিষদ স্বাধীনভাবে তার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। যা এই আইনের একটি ইতিবাচক দিক।

৩। ধারা ১৩

ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণ। ওয়ার্ডসমূহের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এলাকার ভৌগলিক অখণ্ডতা এবং জনসংখ্যার বিন্যাস ও প্রশাসনিক সুবিধাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে একটি ওয়ার্ডের লোকসংখ্যা অন্য একটি ওয়ার্ড হইতে ১০%-এর কম বা বেশি না হয়।

এই ধারার ফলে সরকার সমভাবে তার উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন এবং জনসংখ্যার আনুপাতিক হার অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ এবং সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবে এবং জনগণ তার ন্যায্য অধিকার পাবে। এটি এই আইনের একটি ইতিবাচক দিক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

৪। ধারা ১৮

প্রশাসক নিয়োগ। (১) কোন এলাকাকে ইউনিয়ন ঘোষণার পর ইহার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সরকার একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করিবে এবং এই আইনের বিধান মোতাবেক নির্বাচিত পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসক ইউনিয়ন পরিষদের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করিবেন।

নতুন ইউনিয়ন ঘোষণার পর প্রশাসক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি এই আইনের একটি ইতিবাচক দিক বলে আমরা মনে করি।

৫। ধারা ২৬

পরিষদের সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা। (১) কোন ব্যক্তি এই ধারার উপ-ধারা (২)-এর বিধান সাপেক্ষে পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্যপদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন, যদি-

(ঙ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা পরিষদের বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মে লাভজনক সার্বক্ষণিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;

এই ধারাটির মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে, ফলে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে রেজিস্ট্রেশনকৃত (সরকার অনুমোদিত) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নির্বাচন করার আগ্রহ থাকলেও উপরে উল্লিখিত ধারার অস্পষ্টতার কারণে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছেন। এই সম্পর্কে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়কে ইতোমধ্যে আমরা সাক্ষাতের মাধ্যমে ধারাটি স্পষ্ট করার বিষয়ে অবহিত করেছি। এই বিষয়ে আইন বিশেষজ্ঞদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ সাপেক্ষে এ আইনের অস্পষ্টতা দূর করার কথা থাকলেও আজ অবধি তা করা হয়নি। ফলে এই ধারাটি নিয়ে জনমনে সংশয় তৈরি হয়েছে।

৬। ধারা ৪২

পরিষদের সভা , ক্ষমতা ও কার্যাবলী। (১) প্রত্যেক পরিষদ, পরিষদের কার্যালয়ে প্রতি মাসে অনুন্য একটি সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবে এবং উক্ত সভা অফিস সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইবে।

যা এই আইনের একটি ইতিবাচক দিক হিসেবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

৭। ধারা ৪৯

নাগরিক সনদ প্রকাশ। (১) এই আইনের অধীন গঠিত প্রতিটি পরিষদ, নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন প্রকারের নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, সেবা প্রদানের শর্তসমূহ এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করিবার বিবরণ প্রকাশ করিবে যাহা 'নাগরিক সনদ' বলিয়া অবহিত হইবে।

নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, শর্তসমুহ, নির্দিষ্টসময়ের মধ্যে সেবা নিশ্চিতকরণ, যা আইনের একটি ইতিবাচক দিক।

৮। ধারা ৫৭

বাজেট। (১) প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি অর্থ বৎসর শুরু হইবার অনুন্য ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ওয়ার্ড সভা হইতে প্রাপ্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উক্ত অর্থ বৎসরে একটি সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় বিবরণী সম্বলিত একটি বাজেট প্রণয়ন করিবে।

(২) ইউনিয়ন পরিষদ সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি এবং স্থানীয় জনসাধারণের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠান করিয়া বাজেট পেশ করিবে এবং পরিষদের পরবর্তী সভায় পাস করিবে।

প্রকাশ্য বাজেট প্রণয়নের ফলে ইউনিয়ন পরিষদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং পরিষদের কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে, যা এই আইনের ইতিবাচক দিক।

৯ । ধারা ৬২

ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী। (১) প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের একজন সচিব, একজন হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর থাকিবেন, যাহারা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিযুক্ত হইবেন।

এই ধারার ফলে ইউনিয়ন পরিষদ সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে, যা আইনের একটি ইতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

১০। ধারা ৭৮

তথ্য প্রাপ্তির অধিকার। (১) প্রচলিত আইনের বিধান সাপেক্ষে, বাংলাদেশের যে কোন নাগরিকের পরিষদ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রাপ্তির অধিকার থাকিবে।

এই ধারা অনুযায়ী যে কোন নাগরিক পরিষদ সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে, যা এই আইনের ইতিবাচক দিক।

নেতিবাচক দিক :

১। ধারা ৩৪

চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সাময়িক বরখাস্তকরণ ও অপসারণ। (১) যে ক্ষেত্রে কোন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্যদের বিরুদ্ধে উপ-ধারা (৪)-এ বর্ণিত অপরাধে অপসারণের জন্য কার্যক্রম আরম্ভ করা হইয়াছে অথবা তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলায় অভিযোগপত্র আদালতে কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে অথবা অপরাধ আদালত কর্তৃক আমলে নেওয়া হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের মতে চেয়ারম্যান অথবা সদস্য কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পরিষদের স্বার্থের পরিপন্থী অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হইলে, সরকার লিখিত আদেশের মাধ্যমে চেয়ারম্যান অথবা সদস্যকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারিবে।

প্রতিক্রিয়া : এই ধারাটি আমাদের কাছে নেতিবাচক হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে, কারণ উপজেলা পরিষদ আইন এর ১৩ খ ধারায় বলা হয়েছে যে, পরিষদ বা রাষ্ট্রের হানিকর কাজে জড়িত থাকেন, অথবা দুর্নীতি বা অসদাচরণে বা নৈতিক

স্খলনজনিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন তখন তিনি অপসারিত হইবেন।

একই জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য এই বৈষম্যমূলক আইন কোনভাবেই জাতির কাছে কাম্য নয়। অতএব, এই ধারা সংশোধন/ পরিবর্তনের জন্য সরকারের কাছে আমরা জোর দাবি করছি।

২। ধারা ৭৩ (১)

সরকারের দিক নির্দেশনা প্রদান এবং তদন্ত করিবার ক্ষমতা। (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন সরকার, সরকারের নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যে কোন পরিষদকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন, পরিষদ ও ওয়ার্ড সভার কার্যক্রম পরিচালনা, ইত্যাদি বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে এবং পরিষদ উক্তরূপ দিকনির্দেশনা বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করিবে

ক্রমিক	টাস্কফোর্সসমূহের বিষয়	বিদ্যমান আইনের বিশেষ ইতিবাচক দিক	বিদ্যমান আইনের সীমাবদ্ধতার দিক	প্রস্তাবিত সুপারিশমালা
০১	**ইউনিয়ন পরিষদ আইন, ২০০৯ ধারা ৪ ওয়ার্ড সভা- (১) এই আইনের অধীন ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি ওয়ার্ড সভা গঠন করিতে হইবে।**	ধারাটি এই আইনের একটি ইতিবাচক দিক। এর ফলে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে জন অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের কাছে ইউনিয়ন পরিষদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হবে। এই ধারার ফলে ইউনিয়ন পরিষদ স্বাধীনভাবে তার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। যা এই আইনের একটি ইতিবাচক দিক।		
	ধারা-৪ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের সদস্য ওয়ার্ড সভার উপদেষ্টা হবেন।		সংরক্ষিত আসনের সদস্যদেরকে ওয়ার্ড কমিটি সভায় উপদেষ্টা হিসেবে রাখা হয়েছে, যার পরামর্শ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নেই।	ওয়ার্ড মেম্বরগন উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে ওয়ার্ড সভার সমুদয় কার্য সম্পাদন করবেন।
০২	নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকা ও দায়িত্বের পাশাপাশি তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব	নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ওয়ার্ড সভার উপদেষ্টা হবেন- **ধারা ৫ (৫)** উপকমিটির সদস্য সংখ্যা ১০ (দশ) জনের অধিক হইবে না এবং তন্মধ্যে অন্যূন ৩ (তিন) জন মহিলা হইবে **-ধারা ৬(৫)**	সরকার ইউনিয়নে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ওপর পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সার্কুলার দ্বারা নির্ধারণ করিবে- **ধারা ১০ (৭)** যেকোন ক্ষেত্রে কোন পরিষদের	সরকার ইউনিয়নে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ওপর পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা **আইন দ্বারা নির্ধারণ করিবে- ধারা ১০ (৭)** যে কোন ক্ষেত্রে কোন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্যদের বিরুদ্ধে উপধারা (৪)-এ বর্ণিত অপরাধে

			চেয়ারম্যান বা সদস্যদের বিরুদ্ধে উপধারা (৪) এ বর্ণিত অপরাধে অপসারণের জন্য কার্যক্রম আরম্ভ করা হইয়াছে অথবা তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলায় অভিযোগপত্র আদালত কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে অথবা আমলে নেওয়া হয়েছে, সেইক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের মতে চেয়ারম্যান অথবা সদস্য কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পরিষদের স্বার্থের পরিপন্থী অথবা প্রশাসনিক দৃষ্ঠিকোণে সমীচীন না হলে সরকার লিখিত আদেশের মাধ্যমে চেয়ারম্যান অথবা সদস্যকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারবে	**তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলায় আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হতে হবে যা আপিল পর্যন্ত সুযোগ দিতে হবে।**
	ধারা-৬-এর উপধারা খ, গ এবং ঘ-এর বর্ণিত কার্যাবলী		যদি উপদেষ্টা হিসাবে সংরক্ষিত সদস্যের ভূমিকাকে নির্ধারণ করা না হয় তাহলে সংরক্ষিত	ওয়ার্ড মেম্বরগণ উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে ওয়ার্ড সভার সমুদয় কার্য সম্পাদন করবেন।

			আসনের সদস্যদের ভোটারদের প্রতি করা অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়ন হওয়ার সুযোগ থাকবে না।	
	ধারা-৮ ইউনিয়নকে প্রশাসনিক একাংশ ঘোষণা।		ইউনিয়ন পরিষদকে প্রশাসনিক একাংশ ঘোষণার মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের স্বায়ত্তশাসনের ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে এবং প্রশাসনের অধীন করা হয়েছে যার ফলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার স্বকীয়তা পুরোপুরি খর্ব হয়েছে।	প্রশাসনিক একাংশ শব্দের পরিবর্তে স্থানীয় সরকারের একাংশ শব্দমালা ব্যবহার করতে হবে।
০৩	**ধারা ১৩ ওয়ার্ডের সীমানা নিধারণ**।- (১) **ওয়ার্ডসমূহের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এলাকার ভৌগলিক অখণ্ডতা এবং জনসংখ্যার বিন্যাস ও প্রশাসনিক সুবিধাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে একটি ওয়ার্ডের লোকসংখ্যা অন্য একটি ওয়ার্ড হইতে ১০%-এর কম বা বেশি না হয়।**	এই ধারার ফলে সরকার সমভাবে তার উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন এবং জনসংখ্যার আনুপাতিক হার অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ এবং সুষ্ঠুভাবে বাস্ত বায়ন করতে পারবে এবং জনগণ তার ন্যায্য অধিকার পাবে। এটি এই আইনের একটি ইতিবাচক দিক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।		

০৪	**ধারা ১৮ প্রশাসক নিয়োগ।- (১) কোন এলাকাকে ইউনিয়ন ঘোষণার পর ইহার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সরকার একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করিবে এবং এই আইনের বিধান মোতাবেক নির্বাচিত পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসক ইউনিয়ন পরিষদের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করিবেন।**	নতুন ইউনিয়ন ঘোষণার পর প্রশাসক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি এই আইনের একটি ইতিবাচক দিক বলে আমরা মনে করি।		
	ধারা-২৬ (ছ)			তাহার পরিবারের ওপর নির্ভরশীল কোন সদস্য সংশ্লিষ্ট পরিষদের কোন কাজ সম্পাদনের বা মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার হইতে পারবে না। অথবা চেয়ারম্যান হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পূর্বে অথবা নির্বাচিত হওয়ার পর তার ডিলারশিপ বা ঠিকাদার বা সংশ্লিষ্ট লাভজনক পদ ত্যাগ করতে হবে।
১৭	**ধারা ৩৪ চেয়ারম্যান বা সদস্যগণের সাময়িক বরখাস্তকরণ ও অপসারণ।- (১) যে ক্ষেত্রে কোন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্যদের বিরুদ্ধে উপ-ধারা (৪) এ বর্ণিত অপরাধে অপসারণের জন্য কার্যক্রম আরম্ভ করা হইয়াছে অথবা**		এই ধারাটি আমাদের কাছে নেতিবাচক হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে, কারণ উপজেলা পরিষদ আইনের ১৩ খ ধারায় বলা হয়েছে যে, পরিষদ বা রাষ্ট্রের হানিকর কাজে জড়িত	একই দেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধির জন্য এই বৈষম্যমূলক আইন কোনভাবেই জাতির কাছে কাম্য নয়। অতএব, এই ধারা সংশোধন/পরিবর্তনের জন্য সরকারের কাছে আমরা জোর দাবি করছি।

	তাঁহার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলায় অভিযোগপত্র আদালতে কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে অথবা অপরাধ আদালত কর্তৃক আমলে নেওয়া হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের মতে চেয়ারম্যান অথবা সদস্য কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পরিষদের স্বার্থের পরিপন্থী অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হইলে, সরকার লিখিত আদেশের মাধ্যমে চেয়ারম্যান অথবা সদস্যকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করতে পারিবে।		থাকেন, অথবা দুর্নীতি বা অসদাচরণ বা নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন তখন তিনি অপসারিত হইবেন।	
	ধারা-৩৮ (৩) ও (৫)	৩৮(৫) ধারাটি এই আইনের একটি ইতিবাচক দিক।		বিচারাধীন এবং টেন্ডার প্রক্রিয়ায় দরপত্র খোলার আগ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট নথিছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সকল নথিই ইউনিয়ন পরিষদ এবং এলাকার জনগণ দেখিতে পারিবেন।
	ধারা-৪০			নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটির পাশাপাশি পুরুষ সদস্যদের ক্ষেত্রে পিতৃত্বকালীন ছুটি যোগ করিতে হইবে এবং সরকারি বিধি অনুযায়ী প্রযোজ্য হইবে।

০৫	**ধারা ৪২ পরিষদের সভা,ক্ষমতা ও কার্যাবলী ।-(১) প্রত্যেক পরিষদ, পরিষদের কার্যালয়ে প্রতিমাসে অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবে এবং উক্ত সভা অফিস সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইবে।**	যা এই আইনের একটি ইতিবাচক দিক হিসেবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে		
১৮	**ধারা-৪৬ (৫/গ)**	পরিষদের সচিবের নিকট হইতে পরিষদের প্রশাসনিক বিষয় সংক্রান্ত যে কোন ক্লাসিফাইড রেকর্ড বা নথি তলব করিতে পারিবে এবং আইন ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন-যা ইতিবাচক	তবে তিনি এইরুপ কোন ক্লাসিফাইড রেকর্ড বা নথি তলব করিতে পারিবেন না, যাহা সম্পূর্নরুপে সচিব বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে থাকিবে- যাহা আইনের মাধ্যমে বিতর্কিত কিংবা সাংঘর্ষিক বলে মনে হয়েছে। ধারাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এখানে সচিব বনাম ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এ রকম একটি পরিস্থিতি উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা ইউনিয়ন পরিষদের গতিশীলতার পথ রুদ্ধ করতে পারে।	সত্যিকারের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য যে কোন ক্লাসিফাইড রেকর্ড বা নথি তলব করার এখতিয়ার চেয়ারম্যানের থাকা উচিত।
০৬	**ধারা ৪৯ নাগরিক সনদ প্রকাশ ।-(১) এই**	নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, শর্তসমূহ, নির্দিষ্ট		

	আইনের অধীন গঠিত প্রতিটি পরিষদ, নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন প্রকারের নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, সেবা প্রদানের শর্তসমূহ এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করিবার বিবরণ প্রকাশ করিবে যাহা 'নাগরিক সনদ' বলিয়া অবহিত হইবে।	সময়ের মধ্যে সেবা নিশ্চিতকরণ, যা এই আইনের একটি ইতিবাচক দিক।		
১৯	**ধারা-৫১ (৩/ক,খ ও গ)**	সম্পত্তির ক্ষেত্রে-দান, বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা, বিনিময়ের মাধ্যমে যে কোন সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করিতে পারিবে যা ইতিবাচক	এক্ষেত্রে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের বিষয়টি কি হবে, যা আইনে সুস্পষ্ট কিছু বলা নাই।	এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে।
২০	**ধারা-৫৩ (২/ক)**		জাতীয় বাজেটের বরাদ্ধকৃত অর্থ কিভাবে পাবে সে সম্পর্কে কিছু বলা নাই। যেখানে স্থানীয় সরকারকে বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলা হচ্ছে, সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্ধের কথা বলা হচ্ছে, যা নিঃসন্দেহে মঞ্জুরি বা অনুদান নয়।	জাতীয় বাজেট বরাদ্ধের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে।

০৭	স্থানীয় সরকারের প্রতিটি কাঠামোর বিভিন্ন কাজে জনঅংশগ্রহণ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা	ওয়ার্ড সভা গঠন ধারা -৩ নাগরিক সনদ প্রকাশ ধারা-৪৯		
০৮	**ধারা ৫৭ বাজেট।-(১) প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি অর্থ বৎসর শুরু হইবার অন্যূন ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ওয়ার্ড সভা হইতে প্রাপ্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উক্ত অর্থ বৎসরে একটি সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় বিবরণী সম্বলিত একটি বাজেট প্রণয়ন করিবে।** **(২) ইউনিয়ন পরিষদ সংশিষ্ট স্থায়ী কমিটি এবং স্থানীয় জনসাধারণের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠান করিয়া বাজেট পেশ করিবে এবং পরিষদের পরবর্তী সভায় পাস করিবে।**	প্রকাশ্য বাজেট প্রণয়ন এর ফলে ইউনিয়ন পরিষদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং পরিষদের কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে, যা এই আইনের ইতিবাচক দিক।	কোন ইউনিয়ন পরিষদ অর্থবৎসর শুরু হইবার পূর্বে উক্ত বাজেট প্রণয়ন করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার সম্ভাব্য আয় ব্যয়ের একটি বিবরণী প্রস্তুত ও প্রত্যয়ন করিবে এবং এরূপ প্রত্যয়নকৃত বিবরণী ইউনিয়ন পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলে গণ্য হবে। কিন্তু উপধারা ৩ এ বলা আছে, ইউনিয়ন পরিষদ কোন কারণে বাজেট প্রনয়নে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার সম্ভাব্য আয় ব্যয়ের একটি বিবরণী প্রস্তুত ও প্রনয়ণ করিবে যা পরিষদের	ইউপির বাজেট সচিব এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক হওয়া উচিত। ইউপির বাজেট উদ্বৃত্ত বাজেট করার আইন থাকা উচিত। ইউনিয়নের বাজেট অবশ্যই ইউনিয়ন পরিষদকে করতে দিতে হবে। তবে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসক বাজেট প্রনয়ন করতে পারবেন কিন্ত সেখানে অবশ্যই ইউনিয়নের বিভিন্ন কমিটি ও জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নয়। যদি কোন কারণে ইউপি বাজেট প্রনয়ণ বা সাবমিট করতে ব্যর্থ হয় তাহলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয় ইউপি কর্তৃক করিয়ে আনবেন কোনভাবেই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা করতে পারবেন না।

			অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে, যাহা বাস্তব সম্মত নয় । ইউনিয়ন পরিষদ ব্যর্থ হবে আইনে তা নিশ্চিত করে ধরে নেয়া হয়েছে যা মারাত্বক নেতিবাচক	
০৯	**৫৭ (৩) কোন ইউনিয়ন পরিষদ অর্থ বৎসর শুরু হইবার পূর্বে উক্ত বাজেট প্রণয়ন করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার সম্ভাব্য আয় ব্যয়ের একটি বিবরণী প্রস্তুত ও প্রত্যয়ন করিবে এবং এইরূপ প্রত্যয়নকৃত বিবরণী ইউনিয়ন পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।** **৫৭ (৪) উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপ-ধারা (২)-এর অধীন প্রণীত বাজেটের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বাজেটে কোন ত্রুটি থাকলে উহা সংশোধন করিয়া পরিষদকে অবহিত করিবে এবং অনুরূপভাবে প্রণীত বাজেট ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।**			

১০	**ধারা-৫৯**		নিরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কতজন কিভাবে নিয়োগ হবে সে সম্পর্কে কিছু বলা নাই	জনগণের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতকরার জন্য সোসাল অর্ডিট এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।
১১	**ধারা ৬২ ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী**।- **(১) প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের একজন সচিব, একজন হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর থাকিবেন, যাহারা সরকার বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিযুক্ত হইবেন** ।	এই ধারার ফলে ইউনিয়ন পরিষদ সুষ্ঠ ও সঠিকভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে যা এই আইনের একটি ইতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।		প্রস্তাবিত সুপারিশমালা (হিসাব সহকারী-কাম কম্পিউটার অপারেটর) অবশ্যই ডিসেম্বর ২০১০ সালের মধ্যে বাস্ত বায়ন করতে হবে।
১৩	**ইউনিয়ন পরিষদে উত্তোলনযোগ্য সকল প্রকার কর সংগ্রহ, আদায়, হস্তান্তর যেমন হাট-বাজার, ফেরী ঘাট, জলমহাল এবং মূল্যায়নের ওপর ইউনিয়ন পরিষদের একক কোন কর্তৃত্ব নেই। যা কিনা তাদের স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং বাস্ত বায়নে বাধা সৃষ্টি করে। (ধারা ৬৫-৭০)**			
১৪	**ধারা ৭৩ (১)** সরকারের দিক নির্দেশনা প্রদান এবং তদন্ত করিবার ক্ষমতা।- (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন সরকার, সরকারের নীতির সহিত সংগতি রাখিয়া যে কোন পরিষদকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা,		ইউনিয়ন পরিষদ আইনে বর্ণিত নীতিমালার ভিত্তিতেই সরকারকে ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে। যদি এর ব্যত্যয় হয়	এই ধারাটি (৭৩ এর ১, ২ এবং ৩) অবশ্যই রহিত করতে হবে।

	কর্মকর্তা ও কর্মচারী ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন, পরিষদ ও ওয়ার্ড সভার কার্যক্রম পরিচালনা, ইত্যাদি বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে, এবং পরিষদ উক্তরূপ দিক নির্দেশনা বাধ্যমূলকভাবে অনুসরন করিবে ।		তবে তা স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করণে সরকারের যে প্রয়াস তা পুরোপুরি সাংঘর্ষিক হবে।	
১৫	**ধারা ৭৮ তথ্য প্রাপ্তির অধিকার- (১) প্রচলিত আইনের বিধান সাপেক্ষে, বাংলাদেশের যে কোন নাগরিকের পরিষদ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রাপ্তির অধিকার থাকিবে।**	এই ধারা অনুযায়ী যে কোন নাগরিক পরিষদ সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে যা এই আইনের ইতিবাচক দিক।		

সুপারিশমালা

জনগণের সবচেয়ে কাছের প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদকে কার্যকর, শক্তিশালী এবং গণমুখী করতে জনপ্রতিনিধি, উন্নয়ন কর্মী এবং বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ তুলে ধরা হলো :

১. সংবিধান এবং স্থানীয় সরকারের স্বাতন্ত্রের পরিপন্থী নির্দেশনা বা পরিপত্র জারি থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে গণতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক সরকারগুলো এ ধরনের আইনের অপপ্রয়োগ করেছে।

২. সত্ত্বর ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে বিধিসমূহ যেমন, চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী; সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্যদের ক্ষমতা ও বিশেষ কার্যাবলী, তহবিল

ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ, কর বিধি, বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন-অনুমোদন-বাস্তবায়ন ছাড়াও প্রয়োজনীয় সকল বিধি প্রণয়ন করতে হবে। একই সঙ্গে যত শিগগির সম্ভব ওয়ার্ড সভা, নাগরিক সনদ প্রকাশ, ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ-বাজেট প্রণয়ন-অনুমোদনের পদ্ধতি ও সময়সীমা নির্ধারণ, তথ্য প্রাপ্তির অধিকার বাস্তবায়নে তথ্য চাওয়া ও সরবরাহের পদ্ধতি-নির্ধারিত ফরম-ফি, টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ, ইমারত পরিকল্পনা অনুমোদন ফি এবং নিকাহ নিবন্ধন ফি'র হার/পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করার উদ্যোগ নিতে হবে। তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন বিধি বা প্রজ্ঞাপনসমূহ কোন অবস্থাতেই ইউপির ক্ষমতায়নের পরিপন্থী না হয়।

৩. ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনায় বিদ্যমান আইন, অধ্যাদেশ, বিধি, নীতিমালা এবং জনগুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রজ্ঞাপনসমূহ জাতীয় প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় জনগণকে অবহিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসন, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে সরকারিভাবে স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. ইউনিয়ন পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে ইউনিয়ন পরিষদ আইন প্রেরণ এবং এ বিষয়ে ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. ইউনিয়ন পরিষদসহ মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের যথাশিগগির সম্ভব নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. একটি স্বাধীন ও পর্যাপ্ত ক্ষমতা সম্পন্ন স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন এবং তার অধীনে স্থানীয় সরকার পরিচালনা ও তদারকির উদ্যোগ নিতে হবে।

উপসংহার

এই প্রথমবারের মতো সংসদে আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য একটি উন্নত ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন আইন প্রণয়ন করেছে। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ পাস হওয়ায় স্থানীয় সরকারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর ইউনিয়ন পরিষদ তৃণমূলে জনগণকে সেবা প্রদানে আরো গতিশীল ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে সকলেরই প্রত্যাশা।

আইনটির বিভিন্ন দিক নিয়ে স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞ মহলে আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে। তবে লক্ষণীয়, আইনটি পাস হওয়ার পর এক বছরেরও অধিক সময় পার হলেও মাঠ পর্যায়ে এর তেমন কোন কার্যকর প্রতিফলন দেখা যায়নি বরং এই আইনের পরিপন্থী কিছু পরিপত্র জারি করে সরকার ইউনিয়ন পরিষদকে একটি অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করছে।

আমরা আশা করবো, সরকার আইনের পরিপন্থী পরিপত্র জারি থেকে বিরত থাকবে এবং নতুন আইন বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা দান করবে।